সাহিত্য সওগাত

জমাদিউল আউয়াল
সংখ্যা, ১৪৪২

- ডিসেম্বরের শহর
- শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ
- বিজয়ের চেতনা
- নববর্ষ : আত্মপর্যালোচনার দারুণ উপলক্ষ

সূচী

কবিতা

ডিসেম্বরের শহর: মিঠুন সরকার

স্মৃতিকথা

স্মৃতিবিলাস পঞ্চম পর্ব: জিনাত ইসলাম

প্রবন্ধ

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ: রেজাউল করিম

নববর্ষ : আত্মপর্যালোচনার দারুণ উপলক্ষ : আ. ন. ম. সিরাজুম মুনির

বিজয়ের চেতনা : আসিফ উল আলম সৈকত

মিশ্রগদ্য

প্রাজ্ঞ খলিফা সিদ্দিকে আকবর : এস এম সাজ্জাদুল করিম

নৈতিকতার চর্চা: এম এয়াকুব আলী বাদশা

Sabr and Tawakkul: The Celestial Key to Our Utmost Happiness: Mohammad Abdul Kahhar

গ্রন্থালোচনা

সত্য ও তথ্য: মোহাম্মদ আবু সাঈদ

পছন্দের লিখাটি পড়তে শিরোনামের উপর ক্লিক করুন

সম্পাদকীয়

সাহিত্য সওগাত
জমাদিউল আউয়াল ১৪৪২ | পৌষ ১৪২৭

সম্পাদক
আসিফ উল আলম সৈকত
মোহাম্মদ আবু সাঈদ

প্রচ্ছদ
শেখ আ.ল.ম হুমাইর কায়সান

অঙ্গসজ্জা
সাঈদ মাহমুদ সোহরাব

মূল্য:
পাঠকের তৃপ্তির উপহার
বিকাশ: 01878-431312 (পার্সোনাল)

বিজয়ের শুভেচ্ছা দিয়ে এই কথা বলা জায়েয হবে না যে, দেশের সুবর্ণজয়ন্তীর পিঠা-পায়েশ আয়েশে খেলেও- অখণ্ড ভারত থেকে পাকিস্তানের মাধ্যমে হাতে-কলমে দেশ স্বাধীন হলেও- দেশের অধিকাংশ মানুষের ভাগ্যে জেয়াদা পরিবর্তন ঘটেনি। কিন্তু পাকিস্তানী মিলিটারি, রাজাকার ইত্যাদি শত্রুপক্ষের সাথে নিজের জান নিয়ে মোকাবেলা করেছিল তারাই। বেশিরভাগ জনগণ কলকাতার কলাপাতার আতিথ্য গ্রহণ না করে বাংলাকে হৃদয়ে ধারণ করে থেকে গিয়েছিলেন এবং যুদ্ধে শরিক হয়ে মুশরিক হয়েছিলেন। তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নতি ঘটলো না কেন? মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় হাবুডুবু খাওয়া কোনো জ্ঞানী ব্যক্তি যদি এখানে আলমে বরযখেরও আগে খোদাসৃষ্ট ভাগ্যের দোহাই পাড়েন তাহলে অবাক হওয়াই কাণ্ডজ্ঞানহীন ব্যাপার হবে। আ-নখ-শির চড়াই উতরাই পেরিয়ে, অসংখ্য মানবতাবাদীর কৃপা-করুণায় স্বাধীন (কথার কথা আর কি! মুখের সুখ) বাংলাদেশের জনগণ সুবর্ণজয়ন্তীর মিষ্টিমুখ করতে সমর্থ হলেও মূলত স্বাধীনতা কতটুকু ভোগ করতে পেরেছেন, পারছেন তা নিয়ে প্রশ্ন করা আদবের বরখেলাফ হবে না। তা না হলেও 'বিজয়ের শুভেচ্ছা' জানিয়ে উক্ত কথাগুলো বলা 'মধু হই হই – বিষ খাওয়াইলা'র চেয়ে উঁচুদরের কিছু হবে না। সেজন্য দেশপ্রেমিকদের নিকট দুঃখ প্রকাশ করছি।

সুখের কথা হচ্ছে, ছন্নছাড়া আমরা একটি ওয়েবসাইটের আশ্রয় নিতে যাচ্ছি- পহেলা জানুয়ারি থেকে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে। লেখকদের জন্য আরও খোশখবর হচ্ছে, আমরা কিছু সম্মানির ব্যবস্থা করছি। আগ্রহ, সময় ও শ্রম সবকিছুই বাড়বে আশা করি।

আমরা শুরু থেকেই বিষয়ের চেয়ে লেখার মানের দিকে গুরুত্ব দিয়েছি বেশি- দৃষ্টান্ত হিসেবে প্রথম সংখ্যা থেকে নজরদারি করতে পারেন। যে যা নিয়েই লিখুক, মানসম্পন্ন হলো কি-না তা নিয়েই আমাদের মাথাব্যথা। কিঞ্চিৎ সময়, মানসম্পন্ন না হলেও 'কাছাকাছি' হওয়াতে আমরা প্রকাশ করেছি- এটাকে তরুণ লেখকদের প্রতি আমাদের দুর্বলতা হিসেবে গণ্য করলে অপরাধ হবে না। মানসম্পন্ন লেখার প্রতি আমাদের কঠোরতর পক্ষপাতের অপরাধের শাস্তি হিসেবেই মূলত এই সংখ্যায় লেখার সংখ্যা দেখে আমাদের নিয়মিত পাঠক চমকে যেতে পারেন। তবে আমরা খুশি; কারণ পাঠক বা লেখক যে কারোরই শাস্তি অম্লমধুর হয়ে থাকে। সাথে নজরানা হিসেবে 'কালোত্তীর্ণ' এবং 'শ্রদ্ধা ও স্মরণ' নিয়মিত বিভাগদ্বয়ও পাতিলে ঢাকা আছে।

পাঠক! বিজয়ের শুভেচ্ছা নেবেন। মাঝেমধ্যে তরতাজা বেঈমানী করে নিজেকে 'মানুষ' ভেবে চিন্তার যে সুখ পাওয়া যায়, তার তুলনায় বেঈমানীর লজ্জা 'ভারত-বাংলাদেশ' বন্ধুত্বের মতো কমজোর লাগে।

ডিসেম্বরের শহর

মিঠুন সরকার

এই ডিসেম্বরের শহরে,
একজন কবির পাণ্ডুলিপির খাতা গেছে হারিয়ে।
একটি শব্দও কেউ পড়েনি,
একটি লাইনও আবৃত্তিতে কেউ বলেনি।

অথচ তাঁর কবিতার চরণ এসেছিল
জীবনানন্দের বিস্মৃত ট্রাঙ্ক থেকে।
বিন্যাস এসেছিল কাফকার ডায়েরীর জীর্ণ পাতা থেকে।
সৃষ্টি এসেছিল বিয়াত্রিসকে আরেকটিবার দেখার দান্তের
প্রার্থনা থেকে।

এই ডিসেম্বরের শহরে,
এক লেখকের বাড়ির সামনে দীর্ঘ সারি,
কেউ মুগ্ধ পাঠক লেখার মন্ত্রে,
কেউ বা প্রত্যাশী প্রকাশক অর্থের যন্ত্রে,
কেউ বা দামি প্রচ্ছদকার,
কেউ বা নামি পত্রকার।

তার কলমে উঠে আসা,
পরিত্যাক্ত মার্ক্সবাদের সাথে
প্রকাশকের পুঁজিবাদ হাত ধরাধরি করে চলে।

তার কলমে উঠে আসা
অপরিপক্ক প্রেমের সাথে
তার ব্যক্তিগত লাম্পট্যের গোপন সন্ধি।

তার কলমে উঠে আসা
অসাম্প্রদায়িকতার শুষ্ক বন্দনার সাথে
মৌলবাদী পাঠকের তোষামোদ প্রণয়বন্দী।

কত কিছু হয়ে যায়, বয়ে যায়, এই ডিসেম্বরের শহরে।

কত কবির শত পাণ্ডুলিপি হারিয়ে যায়,
আরেকজন জীবনানন্দ বন্দী রয়ে যায় ট্রাঙ্কে,
কাফকার পোড়া ডায়েরীর সাদা ছাই ওড়ে,
দান্তে আর বিয়াত্রিসকে খুঁজে পায় না।
এই ডিসেম্বরের শহরে...

স্মৃতিবিলাস (পর্ব ৫)

জিনাতুননেছা জিনাত

এবাদাতের ক্ষেত্রে যে এমন প্রতিযোগিতা হতে পারে, ভাবিনি কখনও! যদিও এ আমার একান্ত অনুভূতি, তবে চোখে দেখা সে দৃশ্যের কাছে আমার ভাবনার গভীরতা নিমিষেই হার মেনেছে। দু'বছর আগে প্রথমবার যখন মক্কা-মদিনায় গিয়েছিলাম, সেখানকার সবকিছু দেখে তখন খুব বিস্মিত হয়েছিলাম। ভেবেছিলাম প্রথমবার বলেই বোধহয় এমন হচ্ছে আমার। কিন্তু না, দু'বছর পরেও আমার বিস্ময় একটুও কমেনি বরং বেড়েছে অনেকগুণ। আমার শ্বশুর বাবা, শাশুড়ি মা, অনু আর আমি এই চারজনে ওমরাহ পালনের উদ্দেশ্যে আরব দেশে এসেছি, ১৩ এপ্রিল, ২০১৬ তারিখে। দশ দিনের কর্মসূচি, উদ্দেশ্য এবাদাত করা আর মাঝে মাঝে পবিত্র জায়গাগুলোতে ঘুরে বেড়ানো। যাত্রার শুরু থেকেই বেশ মজার সময় কাটছে আমাদের। এর আগে বাবা-মাকে সাথে নিয়ে এভাবে দেশের বাইরে যাবার সুযোগ হয়নি কখনও। মা-বাবাও সময়টা বেশ আনন্দেই পার করছেন। উনাদের যাতে হাঁটাহাঁটির কষ্টটা কম হয়, এজন্য আমরা Makkah Hilton Tower এ উঠেছি। এই হোটেলটা একেবারে মসজিদের সীমানা ঘেষে গড়ে উঠেছে। ১৩ এপ্রিল রাত সাড়ে এগারোটায় রওনা হয়েছি বাংলাদেশ বিমানে। বিমান যথাসময়ে অর্থাৎ স্থানীয় সময় সকাল সাড়ে ছয়টায় অবতরণ করেছে ঠিকই কিন্তু বিপত্তি বেঁধেছে অন্যখানে। আমাদের ব্যাগগুলোকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। বেশ কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর সৌদি বিমান বন্দরের অভিযোগ কেন্দ্রে গিয়ে অভিযোগ করা হলো। জানা গেলো যে, ট্যাগ খুলে যাবার কারণে কিছু ব্যাগ অন্য বিমান বন্দরে চলে গেছে, আমাদেরটাও তার মধ্যে থাকতে পারে। শুরু হলো অনাকাঙ্খিত অপেক্ষা। সেকেন্ড, মিনিট, ঘণ্টা করে পার হতে লাগলো সময়গুলো। সময় তার নির্দিষ্ট গতিতে পার হয়ে গেলেও আমাদের কাছে মনে হচ্ছে যেন কিছুতেই আর সময় যাচ্ছে না, মনের মধ্যে ঘড়ির কাটা যেন থমকে আছে। সবাই যখন বিরক্তির শেষসীমায় অবস্থান করছে তখন খবর এলো, অভিযোগকারীদের পঁচিশটি ব্যাগ ফেরত এসেছে, তার মধ্যে আপনাদেরটাও থাকতে পারে। ততক্ষণে প্রায় পাঁচ ঘণ্টা কেটে গেছে, ক্ষুধাও চরম আকার ধারণ করেছে। রুটি আর কলা দিয়ে কোনোমতে সকালের নাস্তা শেষ করা হলো। হঠাৎ দেখলাম, বেশ খানিকটা দূরে বেল্টের ওপর আমাদের ব্যাগগুলো যেন পূর্নিমার চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করছে! ততক্ষণে আমাদের জন্য ভাড়া করা নির্ধারিত গাড়িটি এসে দেরী দেখে ফিরে গেছে। অন্য একটা গাড়ি ভাড়া করে আমরা মক্কায় আমাদের হোটেলের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়ি। পড়িমরি করে হোটেলে ব্যাগ রেখে প্রায় ছুটে গিয়ে বায়তুল্লাহর সামনের রাস্তায় জামাতের সাথে জোহরের নামাজ আদায় করি। প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যেই বাবা-মাকে সাথে নিয়ে আসরবাদ তাওয়াফ শেষ করি। মাগরিবের নামাজ পড়ে সায়ী করে চুল কেটে ওমরাহ পালন শেষ করে রুমে ফিরে আসি। কাবা শরীফ সংলগ্ন মসজিদের বর্ধনের কাজ চলছে। তাই অনেক গেট বন্ধ রাখা হয়েছে, এ কারণে সবখানেই প্রচণ্ড ভিড়। এরমধ্যেও সব বেলাতেই আমরা মসজিদের ভেতরে নামাজ পড়ার চেষ্টা করেছি। তাওয়াফ করেছি, কাবাঘরকে ছুঁয়ে মনের সব আবেগ মিশিয়ে স্রষ্টার কাছে আকুতি জানিয়েছি, অভিযোগ করেছি, করুণা চেয়েছি তাঁর কাছে যিনি তার এই অধম বান্দাকে দাওয়াত দিয়ে

মেহমানের সম্মান দিয়েছেন। তিনি শ্রেষ্ঠ, তিনি মহান, তিনি ক্ষমাশীল! তাঁর কাছে বলা যায় নিজের অপারগতার সকল কথা অকপটে, তাঁর কাছে চাওয়া যায় নির্দ্বিধায় সবকিছু। মনে প্রশান্তি হয়, তিনি যেন সেসব কথা শুনতে পেয়ে নিমিষেই পূরণ করে দেন মনের অপূর্ণ সাধ! হাজার হাজার মানুষ সারাক্ষণ তাওয়াফ করছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ প্রতি বেলায় এক জামাতে নামাজ পড়ছে, কি যে বিস্ময়কর ব্যাপার, দেখে চোখ জুড়িয়ে যায়! রাতের আযানটা যেন খানখান করে দেয় রাতের নিরবতাকে। সেই উদাত্ত আহবানকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা সৃষ্টিকর্তা কাউকে দেননি। ইমাম সাহেব যখন নামাজ পড়াতে শুরু করেন, মনে হয় মনের সমস্ত আবেগ মিশিয়ে প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য ভেঙে ভেঙে কি মধুর সুর ঢেলে দিচ্ছেন তাতে, প্রাণের সব আকুতি মসজিদের প্রতিটি দেয়ালে প্রতিধ্বনি তোলে বারবার, ভালোলাগা অনুভূতি শিহরণ তোলে দেহের প্রতিটি লোমকূপে। নামাজ পড়তে আসার এবং নামাজ শেষে ফিরে যাবার দৃশ্যটা দেখতে আমার ভীষণ ভালো লাগে। যারা এটা কখনও দেখেনি, তাদেরকে কোনদিন সেটা ব্যাখ্যা করে বোঝানোর ক্ষমতা কোন শক্তিমান সাহিত্যিকের পক্ষেও অসম্ভব একটা ব্যাপার। এখানে প্রতিটি মুহূর্ত কাটে এবাদাতের মাধ্যমে। ঘর-সংসার, ইহলৌকিক কোনো বিষয়ই মাথায় আসার সুযোগ পায় না। সমস্ত দেহমনে কেবল তাঁরই নামের যিকির। এক ধরণের সুষম প্রতিযোগিতা চলে সবার মনের মাঝে, তাওয়াফ করার জন্য, কাবার সামনে প্রথম সারিতে নামাজ পড়ার জন্য, কখনওবা একটু বেশি দান সাদকার মাধ্যমে একটু বেশি নেকি অর্জনের জন্য। মানুষের মধ্যে কোনো ভেদাভেদ নেই, ধনী গরীব নির্বিশেষে সকল হাজী একই কাজে ছুটে বেড়াচ্ছে সারাদিনমান। অথচ দেশে থাকলে নামাজের সময়টা বের করতেও অনেক সময় আমাদের কাছে দুরূহ মনে হয়। মনে পড়ে, পবিত্র কোরআনের একটা আয়াতে পড়েছিলাম: "কাবা শরীফের বিশেষ মর্যাদা হচ্ছে, যে এখানে প্রবেশ করবে সে দুনিয়া ও আখিরাত উভয় স্থানেই নিরাপদ হয়ে যাবে।" (সুরা আলে ইমরান, ৯৭) তাই কি এই ঘরের জন্য এতো মায়া? কেন বিদায় দিতে অন্তর কেঁপে ওঠে বারবার? নিজের অজান্তেই চোখ ভেঙে বেরিয়ে আসে জলের অনন্তধারা! করুণাময়ের কাছে মিনতি করি, এই অভাগাকে তোমার দয়া থেকে বিতাড়িত করোনা, প্রভু! মনের মধ্যে অব্যক্ত বেদনা চেপে বিদায় নিয়ে আসি, আবার কি দেখা হবে কোনোদিন কাবার সাথে? (চলবে)

১২/১২/২০২০ **(চলবে)**

লেখক:

বিএসসি (অনার্স), এমএসসি, বি এড (জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়), এম.এড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়) সিনিয়র শিক্ষক, ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ প্রকাশিত গ্রন্থ: 'ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ : একজন জয়িতার গল্প' (আত্মজীবনীমূলক), এছাড়াও রয়েছে ২টি উপন্যাস, ২টি গল্পগ্রন্থ, একটি ধর্মীয় গ্রন্থ। প্রথম কাব্যগ্রন্থ: 'তোমার মতো কেউ ভালো নয়' ; প্রকাশিতব্য দ্বিতীয় একক কাব্যগ্রন্থ: 'কবির জন্য কবিতা' (বিশ্বসাহিত্য ভবন প্রকাশনী)।

শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ

রেজাউল করিম

রবীন্দ্র কুঠিবাড়ি

কুমারখালি উপজেলার শিলাইদহে অবস্থিত কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পারিবারিক বাসভবনটি দেশের সাংস্কৃতিক রাজধানীখ্যাত কুষ্টিয়া জেলাকে মহিমান্বিত করেছে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলী নামে যে কাব্যগ্রন্থের জন্য 'নোবেল' পুরস্কার পান, তার অনেক কাব্যই তিনি এ-বাড়িতে বসেই লিখেছেন। বাংলাদেশ প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত 'শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য কর্ম' শীর্ষক পরিচিতিমূলক পুস্তিকা অনুযায়ী এ-বাড়িতে অবস্থানকালে রবীন্দ্রনাথ ৩৮টি কবিতা, ১০টি নাটক, ২টি প্রবন্ধ ও গীতাঞ্জলীর ৯টি গান রচনা করেছেন।[১]

"রবীন্দ্রনাথের বিশাল সাহিত্যসৃষ্টির অর্ধেকাংশের বেশি জন্মলাভ করে শিলাইদহের বোটে পদ্মাবক্ষে, এই কুঠিবাড়িতে, গোরাইয়ের বক্ষে (গড়াই নদীতে : লেখক) ও পদ্মার চরে। তাঁর প্রথম যৌবনের ছোট গল্পের জন্মস্থান শিলাইদহে। তাঁর পৌঢ়কাল পর্যন্ত প্রকাশিত অধিকাংশ রচনাই শিলাইদহের পটভূমিকায় রচিত।"[২] নগর জীবনে বেড়ে ওঠা কবির মানসহৃদয়ে শিলাইদহের অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশ গভীর রেখাপাত করেছিলো- যে কারণে মৃত্যুর অল্প কিছুদিন আগে তিনি লিখেছেন, "আমার যৌবন ও পৌঢ় বয়সের সাহিত্যরস-সাধনার তীর্থস্থান ছিল পদ্মা প্রবাহচুম্বিত শিলাইদহ পল্লীতে। সেখানে আমার যাত্রাপথ আজ সহজগম্য নয়, কিন্তু যেই পল্লীর স্নিগ্ধ আমন্ত্রণ সরস হয়ে আছে আজও আমার নিভৃত স্মৃতিলোকে, সেই আমন্ত্রণের প্রত্যুত্তর অশ্রুতিগম্য করুণ ধ্বনিতে আজও আমার মনে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে, সেই কথা এই উপলক্ষে পল্লীবাসীদের আজ জানিয়ে দিলুম" (১৩৪৬, ১লা চৈত্রের চিঠি, শিলাইদহ পল্লী-সাহিত্য সম্মেলন সম্পাদককে লেখা)।[৩]

শিলাইদহ প্রসঙ্গে অপর এক চিঠিতে তিনি লিখেছেন "আগে পদ্মা কাছে ছিল- এখন নদী বহুদূরে সরে গেছে। ... একদিন এই নদীর সঙ্গে আমার কত ভাব ছিল। শিলাইদহে যখন আসতুম, তখন দিনরাত্তির ঐ নদীর সঙ্গে আমার আলাপ চলতো। ... ছাদের উপর দাঁড়িয়ে যতদূর দৃষ্টি চলে তাকিয়ে দেখি- মাঝখানে কত মাঠ, কত গ্রামের আড়াল, সবশেষে উত্তর দিগন্তে আকাশের নীলাঞ্চলের নীলতল পাড়ের মতো ঐ যে একটি ঝাপসা বাষ্পরেখাটির মত দেখতে পাচ্ছি, জানি ঐ আমার পদ্মা" (২২ চৈত্র ১৩২৮, ভানুসিংহের পত্রাবলী)।[৪]

কুঠিবাড়ির ইতিহাস

রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর ভারতের উড়িষ্যায় তিনটি এবং তৎকালীন পূর্ববাংলায় তিনটি জমিদারী রেখে মৃত্যুবরণ করেন। এগুলো হলো- নদিয়া (বর্তমান কুষ্টিয়া) জেলার বিরাহিমপুর (সদর শিলাইদহ), পাবনা জেলার শাহজাদপুর পরগণা (সদর শাহজাদপুর; বর্তমান সিরাজগঞ্জের অন্তর্গত) এবং রাজশাহী জেলার কালীগ্রাম পরগনা (সদর পতিসর; বর্তমান নওগাঁর অন্তর্গত)। দ্বারকানাথ ঠাকুর বিরাহিমপুর পরগনার জমিদারী নাটোরের রাজার কাছ থেকে ১৮৩৩ সালে কিনে নেন। বিভিন্ন এলাকায়

ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা জমিদারী সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য পরিবারের সদস্যবৃন্দের মধ্যে দায়িত্বভার অর্পণ করেন। এ প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "আমার পিতার উপর আদেশ হল যে তাঁকেই জমিদারী পরিচালনা করতে হবে এবং কলকাতা ছেড়ে বিরাহিমপুরের কাছারি শিলাইদহে গিয়ে বাস করতে হবে"। [৫]

রবীন্দ্রনাথ কিশোর বয়সে পিতামহের সাথে প্রথমবারের মত শিলাইদহে আসেন। তিনি জমিদারীর তদারকীর দায়িত্বপ্রাপ্ত হন ১৮৮৯ সালে। জোড়াসাঁকোর সদর কাছারির হিসাবপত্রে জ.ঞ. স্বাক্ষর দিয়ে রবীন্দ্রনাথ কাজ শুরু করলেন ২ আষাঢ় ১২৯৬ সাল থেকে, ইংরেজি মতে সেদিন ছিল ১৫ জুন ১৮৮৯ খিস্টাব্দ, শনিবার। এর কয়েকমাস পরে অগ্রহায়ণ মাসে তাঁর ওপর জমিদারী পরিদর্শনের ভারও অর্পিত হলো। এই সময়ই ঘটে তাঁর তৃতীয়বার শিলাইদহ ভ্রমণ। "রবীন্দ্রনাথের কাজে সন্তুষ্ট হয়ে ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দের ৮ আগস্ট পাওয়ার অব অ্যাটর্নির মাধ্যমে সমগ্র সম্পত্তির সর্বময় কর্তৃত্ব দেবেন্দ্রনাথ ছেড়ে দেন রবীন্দ্রনাথের উপর"। [৬] শিলাইদহের কুঠিবাড়িতে জমিদার হিসাবে রবীন্দ্রনাথের অভিষেক হয় ১৮৮৯ সালে। ১৯২৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সপরিবারে কুঠিবাড়ি ছেড়ে যান। ঠাকুর পরিবারের জমিদারী ভাগাভাগি হলে বিরাহিমপুর পরগনার (শিলাইদহসহ) জমিদারী পান রবীন্দ্রনাথের ভাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুর। "তিনি শেষবারের মত জমিদারীর তৎকালীন মালিক, তাঁর ভাতুষ্পুত্র সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুরোধে ১৯২৩ সালে শিলাইদহে আসেন"। [৭]

দ্বারকানাথ যখন শিলাইদহের জমিদারী কেনেন তখন বাংলায় চলছে ইংরেজ নীলকরদের দৌরাত্ম্য। নীলকরেরা ঔপনিবেশিক শক্তিবলে চাষীদের দিয়ে ধান ও পাট চাষের পরিবর্তে নীলচাষ করতে বাধ্য করে। শিলাইদহে বাস করতেন মিষ্টার শেলী নামে এক নীলকর। শেলী ও তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পরে তাদের বাসভবন দ্বারকানাথ এর অধিকারে চলে আসে। নীলকুঠি তথা শেলীর বাসভবন প্রসঙ্গে কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "বাবা যখন আমাদের নিয়ে শিলাইদহে গেলেন তখন এই নীলকুঠি নেই- তার ধ্বংসবিশিষ্টই দেখতুম, নদীর ধারে বেড়াতে গেলে। ... বাংলাদেশে এসে পদ্মানদী খুব খামখেয়ালী হয়ে গেছে...। পদ্মার ধারে যারা বাস করে তারা এজন্য সর্বদাই আতঙ্কে থাকে। নীলকুঠির প্রতি অনেকদিন পর্যন্ত পদ্মায় নজর যায় নি, হঠাৎ খেয়াল গেল, সেই দিকের পাড় ভাঙতে শুরু করল। বাড়ীসুদ্ধ নদীগর্ভে যাবে এই ভয়ে বাড়ীটা আগে থেকেই ভেঙে ফেলা হল। তার মালমশলা নিয়ে নদী থেকে খানিকটা দূরে আর একটা কাছারি ও কুঠিবাড়ি তৈরী করা হয়। ... কিন্তু আশ্চর্য, পুরনো কুঠিটা ভাঙা হল বটে, কিন্তু নদী বাগানের গেট পর্যন্ত এসে আবার ফিরে গেল। যতদিন আমরা শিলাইদহে ছিলুম সেই নীলকুঠির ভগ্নাবশেষ অটুট ছিল।" [৮]

বর্তমান কুঠিবাড়ি নির্মিত হয় আরো পরে ১৮৯২ সালে। "এই বাড়ি তৈরির ভার ছিল কবির জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র নীতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপর (চিঠিপত্র ১ম খণ্ড)। পরে পুত্র রথীন্দ্রনাথ বর্তমানরূপে পরিণত করেন এই কবি-ভবনকে।" [৯] ভবনের মালিক জমিদার রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহে অবস্থানকালে বেশিরভাগ সময় কাটিয়েছেন পদ্মাবক্ষে তাঁর প্রিয় বজরায় এবং সেখানেই তিনি সাহিত্য সাধনা করতেন। কুঠিবাড়িতে "দোতলায় পূর্বদিকের বড় কামরায় রবীন্দ্রনাথ নিজে শয়ন করতেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তেতলায় একখানা প্রকোষ্ঠ ও স্নানের ঘর তৈরি হল। রবীন্দ্রনাথ ঐ ঘরটিতেই পরবর্তীকালে সাহিত্য সাধনা করতেন এবং এখানেই ইংরেজি গীতাঞ্জলীর জন্ম হয়।" [১০]

কবি যে কুঠিবাড়ি থেকে জমিদারী পরিচালনা পরিচালনা সাহিত্য-সাধনা করতেন তাই নয়। এই ভবনের সাথে জড়িয়ে রয়েছে কবির নানা কর্মযজ্ঞের স্মৃতি। নীলচাষের আগুনে তৎকালীন কুষ্টিয়া সুপ্রসিদ্ধ রেশম চাষ ও বয়নশিল্প ধ্বংস হয়ে গিয়েছিলো। রাজশাহীর অক্ষয়কুমার মৈত্রের সহযোগিতায় কবি শিলাইদহে রেশমচাষ পুনঃপ্রবর্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। এমনকি কুঠিবাড়ির একটি ঘরে রেশম গুটির চাষ অনুমোদন করেন। এ প্রসঙ্গে তিনি রসিকতা করে লিখেছেন: "শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় মহাশয় কুক্ষণে ২০টি রেশমের গুটি আমার ঘরে ফেলিয়া গিয়াছিলেন। আজ দুই লক্ষ ক্ষুধিত কীটকে দিবারাত্রি আহার এবং আশ্রয় দিতে ব্যতিব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছি- দশ বারোজন লোক অহর্নিশি তাহাদের ডালা সাফ করা ও গ্রাম-গ্রামান্তর হইতে পাতা আনার কার্যে নিযুক্ত রহিয়াছে- লরেন্স জ্ঞান-আহার-নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া কীট সেবায় নিযুক্ত। আমাকে সে দিনের মধ্যে দশবার করিয়া টানাটানি করিয়া প্রায় পাগল করিয়া তুলিল"। [১১] শিলাইদহের কুঠিবাড়ীকে কেন্দ্র করে তিনি অত্র এলাকায় প্রথমবারের মত আলু চাষেরও প্রবর্তন করেন। তিনি উন্নত জাতের ধান চাষেরও প্রবর্তন করেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর আধুনিক চাষাবাদ সম্পর্কে আশা ও হতাশা মিলিয়ে নানা জায়গায় লেখালেখি করেছেন। তিনি লিখেছেন, "আমার চাষ-বাসের কাজও মন্দ চলিতেছে না। আমেরিকান ভুট্টার বীঝ আনাইয়াছিলাম- তাহার গাছপালা দ্রুত বাড়িয়া উঠিতেছে। মাদ্রাজী সরু ধান রোপন করাইয়াছি তাহাতেও কোনো অংশে নিরাশ হইবার কারণ দেখিতেছি না" (চিঠিপত্র ৫ম খণ্ড)। [১২]

শিলাইদহের কুঠিবাড়ী আরো এক বিশেষ কারণে কবি প্রতিষ্ঠিত শান্তি নিকেতনের ইতিহাসের সাথে জড়িয়ে গেছে। শান্তি নিকেতনের অধ্যাপক সে-কালের মরণব্যাধি বসন্ত রোগে মৃত্যুবরণ করলে আবাসিক ছাত্রদেরকে সেখানে রাখা কবি নিরাপদ বোধ করেননি। শান্তি নিকেতনের শিক্ষা কার্যক্রম স্বল্প সময়ের জন্য শিলাইদহের কুঠিবাড়ীতে স্থানান্তরিত করেন। সেখানকার ছাত্রদেরকে তিনি এখানে নিয়ে আসেন। সেটি বাংলা ১৩১০ সালের কথা। ১৩১১ সালের বৈশাখ পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের কাজ শিলাইদহে হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথ প্রজা-হিতৈষী জমিদার ছিলেন। তিনি তাঁর জমিদারীর প্রজাদের শিক্ষা, চিকিৎসা, অর্থনৈতিক উন্নয়ন বিষয়েও চিন্তা ও কাজ করতেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর শিলাইদহ জমিদারীর প্রজা-সাধারণের চিকিৎসার জন্য কাচারি বাড়িতে আটচালা বিশিষ্ট একটি দাতব্য কবিরাজি চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। বরিশালের খোসালে চন্দ্র মজুমদার ছিল চিকিৎসালয়ের প্রথম কবিরাজ। পরবর্তীতে এটি হোমিও চিকিসালয় হিসেবে প্রজা-সাধারণকে চিকিৎসা দিতে থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর জমিদার হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পরে ১৯০৮ সালে প্রজা-সাধারণকে আরও উন্নত আধুনিক চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে চিকিৎসালয়টি কাচারি বাড়ি থেকে স্থানান্তর করেন। তিনি পাকা ভবনে অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা প্রদানের লক্ষ্যে কুঠিবাড়ির অদূরে (কুঠিবাড়ি থেকে কাচারি বাড়ির পথে আধা কিলোমিটার এগোলেই) 'দি মহর্ষি চ্যারিটেবল ডিসপেন্সারী' নাম দিয়ে নতুন চিকিৎসাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন। [১৩] এটি প্রতিষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ অর্থ-সংকটে পড়েন। তিনি প্রজা-সাধারণের কাছ থেকে চাঁদাও সংগ্রহ করেন, তবে তা বাধ্যতামূলক ছিল না। যে প্রজা ২৫ টাকা চাঁদা প্রদান করে তার বার্ষিক খাজনা থেকে তা মুওকুফ করা হয়।

সে-যুগে এমবিবিএস পাশ অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক পাওয়া ছিল কষ্টসাধ্য। মফস্বল জেলা সদরেও এলএমএফ (অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসা বিদ্যায় ডিপ্লোমা) চিকিৎসকরাই চিকিৎসা করতেন। ডাক্তার আগর লাল মজুমদারকে (এলএমএফ) চ্যারিটি ডিসপেন্সারিতে চিকিৎসক হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়। হাসপাতাল প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখেছেন, "এই ডাক্তারখানা আমাদের জমিদারি এবং তার চতুর্পার্শ্বের লোকের বিশেষ উপকার হয়েছে। এই কথা যখন শুনতে পাই তখন সকল অভাবের দুঃখের উপর ঐ সুখটাই বড়ো হয়ে ওঠে। বিরাহিমপুর প্রজাহিতের এই একটিমাত্র কার্যে সফল হয়েছি। ... আমাদের যা কিছু দেনা হয়েছে তা যদি আমাদের জমিদারির এইরকম কাজের জন্য হতো, আমি এক মুহূর্তের জন্য শোক করতুম না।" [১৪]

তথ্যপঞ্জী

১. শিলাইদহে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্য কর্ম : প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর, ঢাকা (প্রকাশকাল উল্লেখ নেই)

২. শিলাইদহ পরিচয় : শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (আবুল আহসান সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃষ্ঠা ১৬

৩. রবীন্দ্রনাথের শিলাইদহ : সোমেন্দ্রনাথ বসু, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (আবুল আহসান চৌধুরী সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃষ্ঠা ৯১

৪. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৯১

৫. শিলাইদহের স্মৃতি : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (আবুল আহসান সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃষ্ঠা ৩০

৬. জমিদার রবীন্দ্রনাথ : শিলাইদহ পর্ব : অমিতাভ চৌধুরী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (আবুল আহসান সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃষ্ঠা ১১৭

৭. সাহিত্যতীর্থ শিলাইদহ : সৈয়দ মুর্তাজা আলী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (আবুল আহসান সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃষ্ঠা ৭৩

৮. রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ৩১

৯. শিলাইদহ পরিচয় : শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, রবীন্দ্রনাথ ও শিলাইদহ (আবুল আহসান সম্পাদিত), শোভা প্রকাশ, ঢাকা ২০০৭, পৃষ্ঠা ২৩

১০. প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা ২৫

১১. শিলাইদহ কুঠিবাড়ি ও রবীন্দ্রনাথ : অশোক কুন্ডু, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৪৩-৪৪

১২. অশোক কুন্ডু, প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা ১৪৪

১৩. শিলাইদহ হাসাপাতাল : এসএম আফজাল হোসেন, রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে, পৃষ্ঠা ৮২, শিলাইদহ রবীন্দ্র সংসদ, ২০১০, কুষ্টিয়া

১৪. পূর্বোক্ত

নববর্ষ : আত্মপর্যালোচনার দারুণ উপলক্ষ

আ. ন. ম. সিরাজুম মুনির

নববর্ষ বা New Year's day– এই শব্দগুলো নতুন বছরের আগমন এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত উৎসব-অনুষ্ঠানাদিকে ইঙ্গিত করে। এতদুপলক্ষে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা, হাসিঠাট্টা ও আনন্দ উপভোগ, সাজগোজ করে নারী-পুরুষের অবাধ বিচরণ ও সৌন্দর্যের প্রদর্শনী, রাতে অভিজাত এলাকার ক্লাব ইত্যাদিতে মদ্যপান, নাচানাচি– এই সবকিছু কতটা ইসলামসম্মত? ৮৭ ভাগ মুসলিম যে আল্লাহতে বিশ্বাসী, সেই আল্লাহ কি মুসলিমদের এইসকল আচরণে আনন্দ-আপ্লুত হন, না ক্রোধান্বিত হন?

উৎসব পালন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে একটি সামগ্রিক ফিনমিনন। সুনির্দিষ্ট কোনো দিবসকে স্মরণীয় করে রাখার গভীর বাসনা থেকে, অথবা আনন্দ-উল্লাস প্রকাশ, কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করা ইত্যাদি থেকে জন্ম নেয় বর্ষান্তরে উৎসব পালনের ঘটনা।

আল্লাহ তাআলা মানুষের এ স্বভাবজাত বাসনা সম্পর্কে সুপরিজ্ঞাত। তাই তিনি তা প্রকাশের মার্জিত ও সম্মানজনক পদ্ধতি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। সৃষ্টিসংলগ্ন সামগ্রিক প্রজ্ঞাময়তা, পৃথিবী বক্ষে মানবপ্রজন্মের দায়দায়িত্ব, আল্লাহর ইবাদত ও দাসত্বের জিম্মাদারি ইত্যাদি বিবেচনায় রেখেই তিনি দিয়েছেন উৎসব পালনে সম্মানজনক বিধান।

আসছে ইংরেজি নববর্ষ। আবারো নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে বিশ্বজুড়ে খরচ করা হবে কোটি কোটি ডলার। আতশবাজি, উদ্দাম নৃত্য, গান পরিবেশন, যুবক-যুবতীদের প্রণয় বিনিময়, একান্তে সময় কাটানো, মদ্য পান ও নারী নিয়ে ফূর্তি করাসহ রকমারি আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিদায় দেয়া হবে ২০২০ সালকে। বরণ করা হবে ২০২১ সাল। দেশের ফাইভ স্টার হোটেলগুলো ও পর্যটন স্পটগুলোয় আয়োজন করা হবে নানা অনুষ্ঠানের। মোবাইল কোম্পানিগুলোর হাওয়া থেকে উপার্জিত অর্থের সৌজন্যে কক্সবাজারে আয়োজন করা হবে চোখ ধাঁধানো বর্ষবরণ উৎসবের। Happy new year 2021 লেখায় রাস্তা ও দেয়ালগুলো সুশোভিত হয়ে উঠবে। নতুন বর্ষকে বরণের উৎসব করতে গিয়ে আরো কত কিছুই না করা হবে!

আমরা কি ভেবে দেখেছি, একটি বছরের বিদায় শুধুই কি আনন্দের? কেবলই ফূর্তি ও উল্লাস প্রকাশের? না, এ কেবল আনন্দের বিষয় হতে পারে না। বরং এটি আমাদের চিন্তা-ভাবনা ও পর্যালোচনার মোক্ষম উপলক্ষ বৈ কি। কেন? কারণ, একটি বছরের সাথে সাথে আমাদের জীবন নামক প্রাসাদ থেকে ৩৬৫ দিনের ৩৬৫টি পাথর খসে পড়ে। ছোট হয়ে আসে আমাদের নাতিদীর্ঘ জীবন। আমরা বিগত বছরটি কিভাবে কাটিয়েছি, আগামী বছর কিভাবে কাটাবো এবং এ বছর আমার অর্জন কী কী? ইত্যকার আরো নানা প্রশ্ন ঘিরে ধরা উচিত আমাদের চেতনা জগতকে।

এখন আমাদের আনন্দ-উল্লাসের এতটুকু ফুরসত থাকার কথা নয়। এখন শুধু হিসাব-নিকাশ মেলাবার সময়। ইসলামের দ্বিতীয় খলীফা উমর ইবন খাত্তাব রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, "তোমাদের কাছে হিসাব চাওয়ার আগে নিজেরাই নিজেদের হিসাব সম্পন্ন করে নাও, তোমাদের আমল ওজন করার আগে নিজেরাই নিজেদের আমলসমূহ ওজন করে নাও, কিয়ামত দিবসে পেশ হওয়ার জন্য নিজেদের প্রস্তুত কর। সুসজ্জিত হও সেদিনের জন্য, যেদিন তোমাদের সামনে কোনো কিছু অস্পষ্ট থাকবে না।"

আমাদের প্রতিটি পদক্ষেপে ভেবে দেখা দরকার, আমরা কী করছি? এর পরিমাণ কী? হাসান বছরী রহিমাহুল্লাহ বলেন, "আল্লাহ ওই বান্দার ওপর রহম করেন, যে তার পদক্ষেপে থামে। (এবং চিন্তা করে) যদি তা আল্লাহর জন্য হয় তা সম্পন্ন করে আর যদি তা হয় অন্য কারও জন্য তবে তা বিলম্বিত করে।" আমরা তো কিঞ্চিৎ নেক আমল করেই তৃপ্তির ঢেকুর তুলি। ইবন আবী মুলাইকাহ্ রহ. বলেন, "আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ত্রিশজন সাহাবীর সাক্ষাৎ পেয়েছি, তাঁরা প্রত্যেকেই নিজের নিফাক সম্পর্কে সন্ত্রস্ত ছিলেন। তাঁদের কেউ এমন ছিলেন না, যিনি বলতেন যে তিনি জিবরীল এবং মিকাঈলের মতো ঈমানের ওপর আছেন।"

বিশ্বের অন্যতম সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলিম নাগরিকের দেশ বাংলাদেশে। এই দেশে টিএসসিসহ উল্লেখযোগ্য সাংস্কৃতিক স্পটগুলোতে থার্টি ফার্স্ট নাইটে নববর্ষ উদযাপনের নামে যেভাবে বেহায়াপনা, অবাধ যৌনাচার ও অপ্রীতিকর ঘটনার অবতারণা হয়, তা একেবারেই অনভিপ্রেত। সরকারকেই এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে হয় অনেকটা বাধ্য হয়ে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীকে কড়া নিরাপত্তা গ্রহণ করতে হয়। ২০০০ সালে থার্টি ফার্স্ট নাইটে বাঁধন নামের একটি মেয়ে শারীরিকভাবে লাঞ্ছিত ও অপমানিত হওয়ার ঘটনা বাংলাদেশের প্রতিটি মানুষকে আহত ও অপমানিত করেছিল।

দু'বছর আগে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে থার্টি ফার্স্ট নাইট পালন করতে গিয়ে কয়েকজন প্রাণ হারিয়েছিলেন। এর বছর তিনেক আগে ব্যাংককের একটি নাইটক্লাবে থার্টি ফার্স্ট নাইটে প্রাণ দিতে হয়েছে কমপক্ষে ৬০ জনকে। আহত হয়েছে আরো অনেকে। থাইল্যান্ডের ওই ক্লাবে তারা যখন আনন্দে আত্মহারা ঠিক তখনই বৈদ্যুতিক শর্টসার্কিটের মাধ্যমে আগুনের লেলিহান শিখা তাদের বেষ্টন করে নেয়। নিমিষেই সমাপ্তি ঘটে সকল আনন্দ-উল্লাসে মত্ত থাকা প্রাণগুলোর। এরপরও কি কেউ শিক্ষা গ্রহণ করেছি? তওবা করে ফিরে এসেছি চিরশান্তির পথে? অথচ আল্লাহ তাআলা বলেন, "আর অবশ্যই আমি তাদেরকে গুরুতর আজাবের পূর্বে লঘু আজাব আস্বাদন করাব, যাতে তারা ফিরে আসে।" (আলিফ-লাম-মীম আস-সাজদাহ, আয়াত: ২১)

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ বলেন, "হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর; আর প্রত্যেকের উচিত চিন্তা করে দেখা সে আগামীকালের জন্য কি প্রেরণ করেছে; তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা যা কর নিশ্চয় আল্লাহ সে বিষয়ে সম্যক অবহিত। তোমরা তাদের মত হইও না, যারা আল্লাহকে ভুলে গিয়েছিল ফলে আল্লাহও তাদেরকে আত্মবিস্মৃত করে দিয়েছিলেন; আর তারাই হল ফাসিক।" (সূরা আল-হাশর, আয়াত: ১৮, ১৯)

আমরা সব অভিভাবকই চাই আমাদের কোমলমতি সন্তানদের জীবন হোক নিরোগ, নিটোল ও অনাবিল সুন্দর। কিন্তু আমরা কি ভেবে দেখেছি নববর্ষের মতো এরূপ নানা উপলক্ষে যখন নিজেদের শাসনের বাঁধন একটু শিথিল করি, একটু সুযোগ দেই গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসাবার, ঠিক তখনই তাদেরকে বন্ধু-সতীর্থরা নিয়ে যায় লক্ষ্যহীন সাময়িক সুখের জীবনে। মাদক ও নেশার ভুবনে। যে ভুবন একটি শান্ত পুষ্পিত জীবনকে করে অশান্ত পূঁতি-গন্ধময়। যে জগত একজন ভদ্র সুবোধ সন্তানকে বানায় মা-বাবার অবাধ্য ও অপ্রিয়।

ইদানিং প্রতি বছরই দেখা যাচ্ছে থার্টি ফার্স্ট নাইট উদযাপন করতে তরুণ-তরুণীরা অধিক সংখ্যায় রাস্তায় বেরুবার সুযোগ পাচ্ছে। ভাবতে অবাক লাগে নিজেদের কলিজার টুকরো মেয়েটিকে পর্যন্ত আমরা মধ্যরাতে পথে-হোটেলে যাবার সুযোগ দেই? এই যে শত শত তরুণী দুপুর-রাতে রাস্তায় বেরিয়ে আসছে, এরা সবাই কি অভিভাবকহীন? নাকি এদের অভিভাবকরা সন্তানদের বগলহীন জীবনকে সাদরে মেনে নিয়েছেন?

মনে রাখা উচিৎ, আমাদের একটু অসর্তকতার জন্য যদি সন্তানরা বিপথগামী হবার সুযোগ পায়। তবে এর ক্ষতির প্রথম শিকার হতে হবে আমাকেই। সমাজে মাথা নিচু হবে আমারই। আপন ঔরসজাত সন্তানের জন্য মানুষের কটু-কাটব্যও হজম করতে হবে কেবল আমাকে। তাছাড়া মরণের পরেও এর জন্য ক্ষতি পোহাতে হবে।

আবদুল্লাহ ইবন উমর রাদিয়াল্লাহু আনহুমা থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন, “তোমাদের প্রত্যেকেই দায়িত্বশীল আর সবাই তোমরা জিজ্ঞাসিত হবে নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে। ইমাম একজন দায়িত্বশীল; তিনি তাঁর দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসিত হবেন। পুরুষ দায়িত্বশীল তার পরিবারের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। মহিলা দায়িত্বশীল তার স্বামীর গৃহের; সে জিজ্ঞাসিত হবে তার দায়িত্ব সম্পর্কে। ভৃত্যও একজন দায়িত্বশীল, সে জিজ্ঞাসিত হবে তার মুনিবের সম্পদ সম্পর্কে। (এককথায়) তোমরা সবাই দায়িত্বশীল আর সবাই জিজ্ঞাসিত হবে সে দায়িত্ব সম্পর্কে।” (বুখারী : ৮৪৪, জুমআ আধ্যায়)

নতুন বছর নতুন কল্যাণ বয়ে আনে, দূরীভূত হয় পুরোনো কষ্ট ও ব্যর্থতার গ্লানি – এ ধরনের কোন তত্ত্ব ইসলামে আদৌ সমর্থিত নয়, বরং নতুন বছরের সাথে কল্যাণের শুভাগমনের ধারণা আদিযুগের প্রকৃতি-পূজারী মানুষের কুসংস্কারাচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণার অবশিষ্টাংশ। ইসলামে এ ধরনের কুসংস্কারের কোন স্থান নেই। বরং, মুসলিমের জীবনে প্রতিটি মুহূর্তই পরম মূল্যবান হীরকখণ্ড, হয় সে এই মুহূর্তকে আল্লাহর আনুগত্যে ব্যয় করে আখিরাতের পাথেয় সঞ্চয় করবে, নতুবা আল্লাহর অবাধ্যতায় লিপ্ত হয়ে শাস্তির যোগ্য হয়ে উঠবে। এই দৃষ্টিকোণ থেকে বছরের প্রথম দিনের কোনো বিশেষ তাৎপর্য নেই।

নববর্ষ উদযাপনের সাথে মঙ্গলময়তার এই ধারণার সম্পর্ক রয়েছে বলে কোন কোন সূত্রে দাবী করা হয়, যা কিনা অত্যন্ত দুশ্চিন্তার বিষয়। মুসলিমদেরকে এ ধরনের কুসংস্কার ঝেড়ে ফেলে ইসলামের যে মূলতত্ত্ব; সেই তাওহীদ বা একত্ববাদের ওপর পরিপূর্ণরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে হবে।

আমাদের সমাজে নববর্ষ যারা পালন করে, তারা কি ধরনের অনুষ্ঠান সেখানে পালন করে, আর সেগুলো সম্পর্কে

ইসলামের বক্তব্য কি? নববর্ষের অনুষ্ঠানাদির মধ্যে রয়েছে: পটকা ফুটিয়ে বা আতশবাজি পুড়িয়ে রাত ১২টায় হৈ হুল্লোড় করে পরিবেশ ও প্রতিবেশের শান্তি বিনষ্ট করে নববর্ষকে স্বাগত জানানো, ব্যান্ড সঙ্গীত বা অন্যান্য গান-বাজনার ব্যবস্থা, সম্ভ্রান্ত পল্লীর বাড়ীতে বা ক্লাবে গান-বাজনা, মদ্যপান ও পান শেষে ব্যভিচারের আয়োজন ইত্যাদি – এছাড়া রেডিও টিভিতে বিশেষ অনুষ্ঠান ও পত্রপত্রিকার বিশেষ ক্রোড়পত্র ও "রাশিফল" প্রকাশ।

এ অবস্থায় প্রতিটি মুসলিমের দায়িত্ব হচ্ছে, নিজে এগুলো থেকে সম্পূর্ণরূপে দূরে থাকা এবং মুসলিম সমাজ থেকে এই প্রথা উচ্ছেদের সর্বাত্মক চেষ্টা চালানো নিজ নিজ সাধ্য ও অবস্থান অনুযায়ী। "এবং তোমরা তোমাদের রবের ক্ষমা ও সেই জান্নাতের দিকে দ্রুত ধাবিত হও, যার পরিধি আসমান ও জমীনব্যাপী, যা প্রস্তুত করা হয়েছে আল্লাহভীরুদের জন্য।" (সূরা আলে-ইমরান: ১৩৩)

বিজয়ের চেতনা

আসিফ উল আলম সৈকত

৫০ বছর হতে চলেছে বাংলাদেশের। অর্ধশত বছরের এই যাত্রাটি অর্জনের হিশেবে দীর্ঘ না হলেও, দৈর্ঘের হিশেবে যথেষ্ট দীর্ঘ। আসলে অর্জনের খাতায় শূন্যতার অভিশাপের কালিমা তো দেশের কারণে লাগেনি, এত উর্বর জমি, এত চমৎকার আবহাওয়া থাকার পরেও যে এই দেশের যথাযথ উন্নতি হচ্ছে না সেই দায় তো দেশের না। পুরো দায়টাই এই দেশের ওপর অধিকার দাবি করা মানুষগুলোর। কেননা এখন এই এদেশের মানুষের কাছে শান্তির একমাত্র অর্থ হচ্ছে, পেটপুরে ভাত খেয়ে, পাটির ওপর পিঠ পেতে নাক ডেকে ঘুমাতে পারা। অথচ, পেটপুরে ভাত খাওয়া এই ছোট-খাটো মানুষগুলোই একদিন শান্তির খোঁজে বুক পেতে দিয়েছিল বড় বড় কামানের সামনে, হাতে তুলে নিয়েছিল অস্ত্র, শান্তির জন্য ভুলেই বসেছিল আরাম-আয়েশ। তবে এখন বদলে গিয়েছে মানুষগুলো। বদলেছে তাদের শান্তির অর্থ। আর এইসব কিছুর মধ্যে পার্থক্য কেবলই পঞ্চাশ বছরের।

আজ বিজয় দিবস বাঙ্গালীর কাছে স্রেফ একটি ছুটির দিন। পরিবারকে, প্রিয়জনকে সময় দেওয়ার একটি মোক্ষম সুযোগ ছাড়া কিছুই না। তাই ঊনপঞ্চাশ বছর পরে এসে অনেকের মুখে শুনতে হয়, "আমি স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসকে আলাদা করার লজিকটা বুঝে উঠতে পারি না।" আজকের দিনে এসে এসব কথা শুনলে একবার বসে ভাবতে ইচ্ছে করে, কেমন হতো যদি ইতিহাসের আকাশে বাঙ্গালীর বিজয়ের সূর্যোদয় না হতো? ৭১-এ বাঙ্গালী পরাজিত হলে কেমন হতো আজকের বাংলাদেশ? হয়তো, আজ যাদেরকে 'মুক্তিযোদ্ধা' বলে স্মরণ করা হয়, তাদেরকে চেনানো হতো 'গাদ্দার' বলে। যেভাবে 'মতিউর রহমানের' কবরের ফলকে লেখা হয়েছিল, 'ইধার সো রাহাহে এক গাদ্দার'। মুক্তিযোদ্ধার ছেলে বা নাতি বলে আজ যাদেরকে এক্সট্রা সুযোগ দেওয়া হয়, তাদেরকে 'মীর জাফরের' সন্তান বলে সবকিছু থেকে বঞ্চিত করা হতো। আজ যাদেরকে 'বীরাঙ্গনা' বলে সম্মাননা দেওয়া হচ্ছে, আল্লাহ জানে তাদেরকে কী বলে সব বই পুস্তকে আখ্যায়িত করা হতো! বাঙ্গালী 'বীরের জাত' হয়ে যেত 'নেমকহারামের জাত'। কিছু জিনিস অবশ্য ভালো হতো, যেমন: স্বাধীনতার ঘোষকের টাইটেল নিয়ে হয়তো বেহুদা টানাটানি চলতো না।

এগুলো সব হতো যদি ১৬ ডিসেম্বর বিজয় আমাদের ভাগ্যে না আসত। ইতিহাসের পাতায় স্বাধীনতার ঘোষণা পুরোটাই হয়ে যেত একটি জাতির বিদ্রোহের ইতিহাস। কিন্তু আফসোস, বিজয়ের ঊনপঞ্চাশ বছর পরে এসেও আমরা এই দিনের গুরুত্ব যথাযথ উপলব্ধি করতে পারি না। আসলে উপলব্ধি করতে না পারার দোষটাও আজকালের ছেলেদের না। দোষটা হচ্ছে দায়িত্বশীলদের। পিতা-মাতা অথবা শিক্ষক কিংবা সরকারসহ সেই প্রত্যকজনের, যারা একজন শিক্ষার্থীর শিক্ষার সাথে কোনো না কোনোভাবে সম্পৃক্ত। কেননা, বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থাতে স্রেফ এটাই যাচাই করা হয় যে, মুক্তযুদ্ধের পটভূমি মুখস্ত করার দক্ষতা এবং তা পরিক্ষার খাতায় হুবহু লিখতে পারার ক্ষমতা কার কতটুকু আছে। পটভূমিকে মনে ধারণের দক্ষতা যাচাইয়ের কোনো

প্রয়োজনই আজকের সমাজে নেই। প্রয়োজন নেই, তাই কোনো উপায়ও নেই। রবীন্দ্রনাথ বলেন, "পুনরাবৃত্তি করিবার শিক্ষা মনের শিক্ষা নহে, তাহা কলের দ্বারাও ঘটিতে পারে।"

যে জীবনে কখনো মধু চেখে দেখেনি, সে বুঝি মধুর জন্য টাকা খরচ করবে? দেশের ষষ্ঠ থেকে দশমের 'সমাজ' বইয়ে মুক্তিযুদ্ধের আলোচনা থাকে। কিন্তু আফসোসের বিষয় হলো অল্প বাড়তি তথ্য ছাড়া প্রতিবছরই প্রায় একই ঘটনার চর্বিতচর্বণ। আমাদের মনে রাখা উচিত, একই খাবার প্রতিদিন প্রতিবেলা খেতে দিলে খাবার প্রতিই একপ্রকার অনিহা চলে আসে এবং ঘৃণা জন্মায় সেই বিশেষ খাবারের প্রতি। তাই, প্রতিবছর একই পদ্ধতিতে মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস শেখানোর ফলে শিক্ষার্থীদের মনে মুক্তিযুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা, সম্মানের কোনো চিহ্নই আর খুঁজে পাওয়া যায় না। তখন তারা কেনই বা বলবে না যে, স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসের মধ্যের পার্থক্যটা তাদের বুঝে আসে না।

এই বুঝে না আসার আরেকটা কারণও অবশ্য আছে। যেহেতু বিজয় দিবস প্রাপ্তিতে আমাদের কোনো অবদানও নেই, কোনো প্রকার সংযুক্তিও নেই, তাই এই বিজয় দিবস নিয়ে আমাদের তেমন কোনো অনুভূতিও নেই। আসলে এই বিজয় দিবস তো 'আজাদের মায়ের'। বিজয় দিবসতো 'একাত্তরের দিনগুলো'র জাহানারা ইমামের, 'হাঙর নদী গ্রেনেডের' সেই বুড়ি মায়ের। এই বিজয় দিবস ত্রিশ লক্ষ শহিদের বিধবা স্ত্রী, ছেলে-সন্তান এবং মা-বাবার। এই বিজয় দিবস অগণিত বীরাঙ্গনার। এই বিজয় দিবস ওই প্রত্যেকের যাদের কোনো না কোনোভাবে অবদান আছে, সংযুক্তি আছে মুক্তিযুদ্ধের সাথে। আর আছে বলেই তারা জানেন এবং খুব ভালো করেই বোঝেন স্বাধীনতা দিবস এবং বিজয় দিবসের পার্থক্য এবং সাথে অনুভব করতে পারেন এর প্রয়োজনীয়তা। এঁদের কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, স্বাধীনতা এবং বিজয় দিবসের পার্থক্যটা কী? আশা করি, তাঁদের চোখের কোণ দিয়ে ঝরে পড়া দু'ফোটা জলই আজকের নবীনদের জন্য পার্থক্য বুঝতে যথেষ্ট হবে।

আমাদের আজকের প্রজন্মকে বুঝাতে হবে যে, ১৯৭১ সালের ৯ মাসের পটভূমি মুখস্ত করে পরিক্ষায় লিখতে পারাতে বাহাদুরী নেই। বরং, আত্মস্থ করে তা প্রয়োগের মধ্যেই সব প্রাপ্তি। বিজয়ের প্রয়োজনীয়তাকে আত্মস্থ করানোর উপায়টা আমাদেরকেই বের করতেই হবে। হতে পারে তা নাটকের মাধ্যমে, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে, গান-কবিতা, আবৃত্তির মাধ্যমে। বই পুস্তক তো আছেই, বয়সানুযায়ী তুলে দিতে হবে প্রত্যেক কিশোর হতে যুবকের হাতে। আমাদেরকে কেবল প্রয়োজনটা অনুভব করতে হবে, এরপর শত শত পদ্ধতি এমনিতেই বেরিয়ে আসবে। ক্রিকেট খেলায় বাংলাদেশের বিজয়ে আমরা যতটা খুশি হই, ১৬ ডিসম্বরের কথা স্মরণ হলে এরচেয়ে বেশি না হোক, অন্তত একই ধরণের আনন্দ, ঠিকই একই রকমের উচ্ছ্বাস আমাদের অনুভব করতেই হবে। সেই অনুভূতির জন্য যা যা করা প্রয়োজন সবকিছুই করতে হবে আমাদের।

স্কুল-কলেজ কিংবা শিক্ষার সাথে সম্পৃক্ত এবং দায়িত্বশীলদের দিকে চাতক পাখির মত তাকিয়ে থাকলে এগুলো কখনোই সাধন হবে না। যেভাবে কবিগুরু বলেছেন, "দেশের লোককে শিশুকাল হইতে মানুষ করিবার সদুপায় যদি নিজে উদভাবন এবং তাহার উদ্যোগ যদি নিজে না করি, তবে আমরা সর্ব প্রকারে বিনাশপ্রাপ্ত হইব...। বস্তুত আমরা প্রত্যহই মরিতেছি অথচ তাহার প্রতিকারের উপযুক্ত চেষ্টামাত্র করিতেছি না, তাহার চিন্তামাত্র যথার্থরূপে

আমাদের মনেও উদয় হইতেছে না, এই–যে নিবিড় মোহাবৃত নিরুদ্যম ও চরিত্রবিকার- বাল্যকাল হইতে প্রকৃত শিক্ষা ব্যতীত কোনো অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠানের দ্বারা ইহা নিবারণের কোনো উপায় নাই”। (শিক্ষা সংস্কার)

৫০তম বছরে পাঁ রাখতে যাওয়া বাংলাদেশকে বয়সের ভারে নুইয়ে পড়া সেই অবহেলিত বৃদ্ধার সাথে তুলনা করব, নাকি কোনো শিশুর সাথে, অযত্নে যার শারীরিক-মনসিক উন্নতির কোন দেখা মিলছে না। অন্য কোনো জাতি হলে হয়তো এতদিনে আশা ছেড়েই দিত। কিন্তু আমরা কিনা বাঙ্গালী। আর কবিগুরু বলে গিয়েছেন, “মানুষে বিশ্বাস হারানো পাপ।” তাই আমরাও দেশ এবং দেশের জনগণের ওপর থেকে কখনোই আস্থা হারাই না। তাই তো এত অধঃপতনের পরেও হাল ছাড়েনি কেউই। এখনো এদেশের মানুষ স্বপ্ন দেখে। সুন্দর আগামীর স্বপ্ন। উন্নত বাংলাদেশের স্বপ্ন। যদিও সময়ের সাথে সাথে বাংলার আবওহায়া বদলেছে, বদলেছে জীবনব্যবস্থা, শখ-আহ্লাদ, চাহিদা আরো কত কিছুই না বদলেছে। এতকিছু বদলের মাঝেও যা একেবারেই বদলায়নি তা হলো, এদেশের মানুষের বাঙ্গালী হয়ে জন্মানো এবং পূর্বে শত শত বাঙ্গালীর আত্মত্যাগী চেতনা। তাই আমাদের কাজ হলো বাঙ্গালীকে বাস্ একবার তার বাঙ্গালীত্ব স্মরণ করিয়ে দেওয়া, বাকিটা অগ্রজদের চেতনাই করে দেখাবে। তখন বাংলাদেশ আর শত বছরেও বৃদ্ধ হবে না। যৌবন তার সর্বাঙ্গে শোভা পাবে। হয়তো এই ভাবনা থেকে কবি সুকান্ত বলে উঠেছিল, “এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে।”

প্রাজ্ঞ খলিফা সিদ্দিকে আকবর

এস এম সাজ্জাদুল করিম

বিরহের বাতাস বইছিল গোটা আরবজুড়ে। কেবল মানুষ নয়, প্রকৃতিও যেন মাঝেমাঝে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠছিল। রসুল (দ.) দুনিয়া হতে পর্দা করেছেন মাত্র। ইসলামকে শেকড় থেকে উপড়ে ফেলার ষড়যন্ত্র করা মানুষগুলো তখনো জীবিত। এর সাথে চির অনিয়মতান্ত্রিক বেদুইন তো ছিলই। সবাই পেয়ে গেল মোক্ষম এক সুযোগ। যেমন চিন্তা তেমনই কাজ। দেরি না করেই শুরু করে দিলো আক্রমণ। কেউ আসল মিথ্যা নবুয়্যাতের দাবি নিয়ে, কেউ উঠে পড়ে লাগলো ইসলামি বিধানকে মনমতো ব্যাখ্যা করতে, যাকাত অস্বীকার করার মাধ্যমে। ব্যথিত মুসলিম তাদের ব্যাথার সাথে মানিয়ে ওঠার সময়টুকু পেল না। এই পরিস্থিতিকে সামাল দেওয়া জন্য মুসলিম জাতির প্রয়োজন ছিল একজন প্রতিনিধির, এমন প্রতিনিধি যাঁর প্রজ্ঞা এবং বুজুর্গির পদচারণায় কেঁপে ওঠবে মুরতাদের অন্তর। যাঁর ডাকে মুসলমানরা দেখিয়ে দেবে তাঁদের ক্ষমতা।

ঠিক সেই প্রয়োজনীয়তার চাহিদা মেটাতে মুসলিম জাতির নেতৃত্ব দিতে সামনে এগিয়ে এলেন প্রজ্ঞাবান এবং বুজুর্গ সাহাবি, হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গুহার সঙ্গী, আবু বকর সিদ্দিক (রা.)। তাঁর যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন ছিল না কারোই। মুহাজির কিংবা আনসার সবাই একবাক্যে স্বীকার করে নিয়েছিলেন তাঁর খেলাফত। তাঁকে মেনেছিলেন নিজেদের ‘খলিফা’ হিশেবে।

তাঁর সময়টা ছিল অত্যন্ত চ্যালেঞ্জিং। চারদিকে যেন শুধু বিদ্রোহের কলরব। বিশ্বাসঘাতকদের সয়লাব। কেউ ইসলামি শাসনব্যবস্থা মানছে না, আর কেউ মানছে না ইসলামি বিধান। তাই সিদ্দিকে আকবর তাঁর প্রথম পদক্ষেপ নেন তুলায়হা, মুসায়লিমা ও সাজাহর নামক তিনজন নবুয়্যতের ভণ্ড দাবিদারের বিরুদ্ধে। এই অভিযানের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করা যে, নবিজির ওফাতের পর মুসলিমরা সামন্যতমও দুর্বল হয়ে যায়নি। যেমন চাওয়া তেমনই প্রাপ্তি। খালিদ বিন ওয়ালিদের সেনাপতিত্বে সামরিক অভিযান চালান সিদ্দিকে আকবর। এই অভিযান ছিল মুসলমানদের আত্মবিশ্বাস ফেরানোর এক সার্থক অভিযান। হয়েছিলেন শতভাগ সফল। শক্ত হয়েছিল নিজেদের মধ্যকার সম্পর্ক। এরই ধারাবাহিকতায় পরবর্তীতে দৃঢ় হয়েছিল সিনান ও বাইজাইন্টাইনের মাঝে আরবদের শক্তিশালী অবস্থানে টিকে থাকা। পুরো আরবকে আবারো শুনিয়ে দিলেন মুসলমানদের গগনভেদী গর্জন। জানিয়ে দিলেন মুসলমানদের ক্ষমতায় কিংবা শক্তিতে সামান্য পরিমাণও ক্ষয় ধরেনি।

কুরআন সংকলন ছিল সিদ্দিকে আকবরের অন্যতম বড় সংস্করণ। ইয়ামামার যুদ্ধে যখন হাফেজরা শহিদ হলেন তখন কুরআনের কোন অংশ হারিয়ে যাওয়ার ভয়ে উমর

ফারুক (রা.)'র পরামর্শে তিনি কুরআন সংকলন করেন। যা পরবর্তীতে সংরক্ষিত হয়।

যাকাত অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে তাঁর অবস্থান ছিল একেবারে সুদৃঢ়। এতটাই সুদৃঢ় যে, তাদের বিরুদ্ধে তিনি দিয়ে বসেছিলেন যুদ্ধের ঘোষণা! ভাবা যায়, শুধু যাকাত দিবে না বলে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা! প্রজ্ঞাবান এবং সদাশান্ত সিদ্দিকে আকবরের কাছ থেকে এমন ঘোষণা শুনে কিছুটা হতবাক হলেন হযরত ওমর ফারুক। সিদ্দিকে আকবরের কাছে এসে বললেন, "হে আবু বকর, আপনি তাদের বিরুদ্ধে কীভাবে যুদ্ধ করবেন, তারা তো মুসলমান?" ওমর ফারুকের কথা শুনে ক্ষেপে গেলেন সিদ্দিকে আকবর এবং বললেন, "হে ওমর! ইসলামের আগে তো তুমি অনেক বীর ছিলে! তোমার সেই বীরত্ব আজ কোথায় গেল?" সিদ্দিকে আকবর বললেন, "আমি আবু বকর বেঁচে থাকতে ইসলামের কোন বিধানে সামান্যতম আঘাত আসবে, আর আমি তা মুখ বুজে সহ্য করব তা কখনোই হবে না। যারাই যাকাত আর সালাতের মাঝে পার্থক্য করবে আমি তাদের বিরুদ্ধে শেষ রক্তবিন্দু থাকা পর্যন্ত যুদ্ধ করবো।"

সিদ্দিকে আকবরের সেই সিদ্ধান্ত ছিল কালজয়ী সিদ্ধান্ত। ইতিহাসের পাতায় তা আজ অবধি পূর্ণিমার চাঁদের মতো জ্বলজ্বল করে জ্বলছে ও আলো ছড়াচ্ছে। পরবর্তীতে ওমর ফারুক রা. বলেছিলেন, "আবু বকরের সেদিনের ধমক আমার অন্তর খুলে দিয়েছিল। আমিও পরে বুঝতে পেরেছিলাম, আবু বকরের সিদ্ধান্তই ছিল সময়োপযোগী ও সঠিক।"

সিদ্দিকে আকবরের খেলাফতকাল ছিল মাত্র দু'বছর। অথচ এই সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি ইসলামি রাষ্ট্রকে একতাবদ্ধ রেখে করে তুলেছিলেন আরো শক্তিশালী। রসুলের রেখে যাওয়া আদর্শকে সাথে নিয়ে তিনি আরো শক্তিশালীভাবে প্রতিষ্ঠা করেন ইসলামী সাম্রাজ্য। রসুলের সাথে ছায়ার মত থেকে ইসলামকে যতটুকু অনুভব করেছিলেন, সবটুকুই ঢেলে দিয়েছিলেন এই দুই বছরের খেলাফতে। ধর্মের বিধানের প্রতি তাঁর দৃঢ়তা, রসুলের প্রতি তাঁর ভালোবাসা, ইসলামের সব আদেশের অভ্যন্তরে লুকিয়ে থাকা সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় ভারসাম্যকে অন্তর দিয়ে বোঝার ক্ষমতা সিদ্দিকে আকবরকে পৌঁছে দিয়েছে সর্বসাধারণ এবং সকল মুসলিম শাসকের জন্য অনুপম দৃষ্টান্তের শিখরে।

নৈতিকতার চর্চা

এম এয়াকুব আলী বাদশা

মহান স্রষ্টার আঠার হাজার মাখলুকাতের মধ্যকার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টির নাম মানুষ। নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠত্বের বিচারে নিজের মান অক্ষুণ্ণ রাখতে শ্রেষ্ঠ গুণাবলী মানুষ নামক শ্রেষ্ঠ জীবের তথা আমাদের মাঝে থাকা অবশ্যক। কেননা রাহমানুর রাহিম প্রভু মানুষের কল্যাণের জন্যই বাকি সব সৃষ্টিকে তৈরি করেছেন। আর মনুষ্য জাতীকে সৃষ্টি করেছেন কেবল আল্লাহ রাব্বুল আ'লামিন এঁর ইবাদতের জন্য।

কিন্তু সময়ের সাথে সাথে সমানুপাতিক হারেই বেড়েই চলেছে মানুষের নৈতিক অবক্ষয়। মেকি আচরণতো আমাদের শ্বাসপ্রশ্বাসের মতো বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমরা 'লোকদেখানো' রীতি দিয়ে জীবনকে ভরপুর করে তুলেছি। লোকদেখানো সালাত, লোকদেখানো হজ্ব, লোকদেখানো সদকাহ, লোকদেখানো সততা, লোকদেখানো সৎকর্ম, লোকদেখানো সত্যের বাণী, লোকদেখানো ভালো মানুষী- সকাল-দুপুর, সন্ধ্যা-সাঁঝে আমাদের শিরা-উপশিরায় মিশে গেছে এই 'লোকদেখানো'।

যে কোন মূল্যেই সমাজে ভালো সেজে থাকতেই হবে, যে কোন মূল্যেই ফেরেস্তার ভান করতেই হবে! এতো এতো পাপ করার পরেও নিজেকে পূর্ণ ঈমানদারের সার্টিফিকেট দিয়ে দিতে পারার মধ্যেই যেন লুকিয়ে আছে অদ্ভূত স্বর্গীয় প্রশান্তি। এরা যেন ভুলেই যায় যে, একদিন কেয়ামত হবে, একদিন তাদেরকে এইসব কিছুর জন্য জবাব দিতেই হবে। এটা মূলত কেয়ামতকে অস্বীকার করার নামান্তর। নৈতিকতাহীনতার পেছনে যেসব কারণগুলো জোড়ালো ভূমিকা রাখে, তার মধ্য হতে কতিপয় বিষয় আল্লাহ সুবাহানাহু ওয়াতায়ালা কুরআনুল কারিমের সুরা আল-মাউনে পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

পরকালে অস্বীকারকারী

আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন, "أَرَءَيْتَ ٱلَّذِى يُكَذِّبُ بِٱلدِّينِ - আপনি কি দেখেছেন তাকে, যে বিচারদিবসকে অস্বিকার করে?"

যে কাজে জবাবদিহিতা যত বেশি, সেই কাজে ভুল করার পরিমাণ ততই কম। কেউ যদি বিশ্বাস করে যে, এই জীবনে ৫০-৬০ বছর শেষ করার পর এমন এক জীবনের দিকে ফিরে যেতে হবে, যা অনন্ত। সেখানে ভালো কিছু পেতে হলে এখানেই ভালো কিছু করতে হবে, তখন সে ওই পরকালের ভয়ে অথবা উত্তম কিছু পাওয়ার লোভে হলেও সমাজে মন্দ কাজ করা থেকে নিজেকে বিরত রাখবে।

দুর্বলের প্রতি নিষ্ঠুর

তারা একইভাবে মিসকিনদের প্রতিও সদয় হয় না, এক বেলা খাবার অসহায় নিঃস্বদের দিতে গেলে যার সমস্ত ব্যাংক ব্যালেন্স শূণ্যের কোটায় নেমে যায় আবার আড্ডার মঞ্চে তাদের দানশীলতার ঝংকার হৃদয়ে কম্পন ধরিয়ে দেয়। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন, "فَذَٰلِكَ ٱلَّذِى يَدُعُّ ٱلْيَتِيمَ সে তো সেই ব্যক্তি, যে এতীমকে গলা ধাক্কা দেয়।"

বড় নামাজী

যে মানুষটা সুদকে একমাত্র লাভজনক ব্যবসা হিসেবে নিয়ে নিঃস্বকে আরো সম্বলহীন ফকির বানায়, হালাল রুজির নিয়ামতকে ভুলে হারামের মাঝে আরাম খুঁজে পায়, যারা সরকারী চাকরি নামক সোনার হরিণটাকে ধরতে পারলেই সেখানে দূর্নীতির বাজার জমায়, এরকম অনেক ব্যক্তিই নিজেদের নামাজী, মুত্তাকী সাজাতে মসজিদের প্রথম কাতারে সালাত আদায় করে থাকে। এমনকি তারা মসজিদও নিয়ন্ত্রণে রাখার পায়তারা করে, তাদের ব্যাপার স্বয়ং আল্লাহ রব্বুল আলামিনের ফতোয়া হচ্ছে, "فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ - অতএব দুর্ভোগ সেসব নামাজীর; الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ -যারা তাদের নামাজ সম্বন্ধে অমনোযোগী; الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ - যারা তা (নামাজ) লোক-দেখানোর জন্য (আদায়) করে।

কৃপণ ব্যক্তি

সমাজের ভারসাম্য বজায় রাখতে এটা অত্যন্ত জরুরী যে, স্বচ্ছল পরিবারের পক্ষ থেকে অস্বচ্ছলদের সাহায্য করতে হবে। যাদের নুন আনতে পান্তা ফুরায় এদের দেখভালের দায়িত্বটা আপনা-আপনি চলে যায়, সমাজের বিত্তবানদের ওপর। এখন অবস্থা তো এমন যে, নিজ থেকে গরিবদের খবর নিয়ে তাদের সাহায্য করার দায়িত্বটুকু তো পালন করে না, আবার যখন কেউ ঘরের দুয়ারে চলে আসে তখনো নিজ দায়িত্ব সম্বন্ধে কোনো ভাবনাই রাখে না। আবার অনেকে দিলেও কত ধরনের উচ্চবাচ্য যে করে তার কোনো ইয়ত্তা নেই। এদের ব্যাপারেই আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করছেন, "وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ - এবং প্রয়োজনীয় ছোটখাটো সাহায্য দানে বিরত থাকে।" (সুরা আল-মাউন, ১-৭ নং আয়াত)

বর্ণিত পবিত্র সূরাটি আমাদের সমাজের নিষ্ঠুর বাস্তবতাকে পরিষ্কারভাবে তুলে ধরে। আমরা আজ সৌজন্যচর্চিত মানুষের রূপান্তর হয়েছি। সৌজন্যমূলক আচরণকে নৈমিত্তিক করে এর প্রবাহ বাড়াচ্ছি। সমাজকে চালিত করতে গিয়ে সমাজব্যবস্থার নৈতিকতা লোপ করছি। বস্তুত হৃদয় দিয়ে সমাজব্যবস্থার ভিত্তি ঠিক করে সার্বিক নৈতিকতার প্রশ্নে আমরা রং হারাচ্ছি। আমরা মানুষ হয়ে মনুষ্যজাতির জন্য কিছু করতে রাজি নয়। আমরা সমাজের প্রতি নৈতিক দায়বদ্ধতা থেকে সরে এসেছি। আমরা 'লোকদেখানো' ভালো মানুষ সাজতে কত রকমের যে বাহানা করি তা ড্রামা সিরিয়াল আকারে প্রকাশযোগ্য। কিন্তু বিশ্বমানবতার মুক্তির দূত রাসূল (দ.) কত অপরূপ মানবিক মানুষ হতে শিক্ষা দিয়েছেন আমাদের। একদা হযরত আবু জর (রা.)কে উদ্দেশ্য করে বলেন, "হে আবু জর! তুমি ঝোল (তরকারি) রান্না করলে তার ঝোল বাড়িয়ে দিয়ো এবং তোমার প্রতিবেশীকে তাতে শরিক করিও।" (মুসলিম, হাদিস : ২৬২৫)

সমাজব্যবস্থাকে সুন্দর ও মজবুত ভিত্তির উপর স্থাপন করার জন্য সর্বশ্রেষ্ঠ সমাজ সংস্কারক নবী মোস্তাফা (দ.) ঘোষনা করেন, "এক মুসলমানের উপর অপর মুসলমানের হক্ব ৬টি; যখন সে সালাম দেয় তার উত্তর দিবে। যখন সে অসুস্থ থাকে তাকে দেখতে যাবে। যখন সে হাঁচি দেয় তখন ইয়ারহামুকাল্লাহ বলবে। যখন সে দাওয়াত করে তা গ্রহণ করবে। যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা তার দ্বীনি ভাইয়ের জন্য পছন্দ করবে, আর যা সে নিজে অপছন্দ করে তা তার দ্বীনি ভাইয়ের জন্যও অপছন্দ করবে। সে মারা গেলে জানাজায় অংশগ্রহণ করবে।" (মুসলিম শরীফ : ২১৬২) সাহাবীগণকে উদ্দেশ্যে করে হুজুর পূরনুর (দ.) ইরশাদ করছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি ঈমান রাখে এবং

আখেরাতে বিশ্বাস রাখে সে যেন স্বীয় প্রতিবেশীকে সম্মান করে।" (বুখারি, হাদিস : ৬০১৮) অন্যত্র বলেছেন, "যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন প্রতিবেশীর সঙ্গে সদাচরণ করে।" (মুসলিম, হাদিস: ১৮৫)

এমনকি নারীরাও যে সমাজে সৌহার্দ্যপূর্ণ অবস্থা ও নৈতিক অবস্থান ধরে রাখতে অগ্রণী ভুমিকা পালন করে সেই দিকটা খুবই সুক্ষ্মভাবে উঠে এসে একটি হাদিসে, "হে মুসলিম নারীগণ! তোমাদের কেউ যেন প্রতিবেশীকে হাদিয়া দিতে সংকোচবোধ না করে। যদিও তা বকরির খুরের মতো নগণ্য বস্তুও হয়।" (বুখারি, হাদিস : ৬০১৭)

সমাজের নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিরা যদি ইসলামের সুমহান জীবনাচরণকে পরিপূর্ণ গ্রহণ করে সুন্দর জীবন অতিবাহিত করেন এবং সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যাহিক কুরআন-সুন্নাহ'র আমলগুলো চর্চা করেন, তবে এই সমাজের রূপ বদলে যাবে। শিশুরা পাবে সুষ্ঠুভাবে বেড়ে উঠার উপাদেয়, কিশোররা পাবে সত্যের দিশা, যুবকরা পাবে ন্যায়ের মশাল আর প্রবীণরা পাবেন সুখের অবকাশ!

আল্লাহ পাক রাব্বুল আ'লামিন যেন তাঁন প্রিয় হাবীব (দ.) এঁর সদকায় আমাদের সমাজ সংস্কৃতিকে নৈতিক অধঃপতন হতে রক্ষা করেন এবং আমাদের যেন আখলাকে হাসানাহ দান করেন, আমিন।

Sabr and Tawakkul : The Celestial Key to Our Utmost Happiness

Mohammad Abdul Kahhar

'DEPRESSION, FAILURE, FINANCIAL SETBACK' - these are very commonly used words in the lips of the young city-dwellers. Unlike the aged, the young of today are acutely accustomed to flying in a fancy arena of sky-high aspirations and dreaming of having a life full of luxuries. In a nutshell, it is simply an idiocy of trying to build castles in the air. For that, what is happening is the evolution of those emotion-creating lame words.
What are responsible for such kinds of situations are, in my words, the absence of Sabr (Patience) and Tawakkul (Dependence upon Allah).

'Life is not a bed of roses' is a well-known proverb. Indeed, our total span of life is nothing but an exam-hall. We're naturally bound to face exams. Referring to that the Almighty utters,

"We (I) will undoubtedly testify you by Khawf (Despair), Zuu' (Hunger), Naqsim Minal Amwaal (Financial Setbacks)..."
[Surah Baqarah 2:154]

Hence, what is the ultimate solution? How can we get rid of those problems? As problems come to the light, prospects can never remain covert. In this regard, the revelation of the Omniscient is,

"Don't get upset (Laa Takhaf), don't get anxious (Laa Tahzan). Obviously Allah is always with us."

When we are trapped into thousands of problems, we ought to revert to the Almighty, go to Sajdah, pay Dua's in His court. And He is here to teach us the right procedure,

"O Believers, seek help (Istayeenuu) by Sabr and Salah. Indeed, Allah is with those who patiently endure."
[Surah Baqarah 2:152]

When we are in despair and passing sleepless nights randomly, then Sabr and Tawakkul can pave us the right path. Sabr relieves our sufferings and Tawakkul dictates us the hope and inspiration we need to resume a novum

confluence. In this way, we can be able to surf around an ambiance of celestial happiness. The Omnipotent inspires us saying that,

"And those who only rely on Allah, Allah is sufficient for them."
[Surah Talaaq 65:2]

গ্রন্থসমালোচনা

সত্য ও তথ্য (অসম্পূর্ণ আত্মজীবনী)

আমীনুর রশীদ চৌধুরী

সাহিত্য প্রকাশ, ২০১০

আলোচকঃ মোহাম্মদ আবু সাঈদ

'হাতি পর হাওদা, ঘোড়া পর জিন
জলদি আও, জলদি আও ওয়ারেন হেস্টিন।'

আমীনূর রশীদের তারুণ্যদীপ্ত এই জার্নিটা আমাদের জানা দরকার।

আত্মবয়ানের শুরুতেই যখন ব্যক্তি "আমি তো শিশুকাল থেকেই কেতাদুরস্ত ইংরাজদের সাহচর্যে ও লালনে মানুষ। আমার চোখে মানুষ ওরা-ই। এই দেশের লুঙ্গি, ধূতি পরা কালো মানুষদের আমি নিতান্ত কৃপার চোখে দেখতাম।" বলেন, তখন আর বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, ব্যক্তি যথাসম্ভব অকপট সত্য নির্দ্বিধায় বলার চেষ্টা করবেন। 'ইংরাজদের সাহচর্যে ও লালনে মানুষ' হওয়া এই আমীনূর রশীদ চৌধূরীকে পিঠ চাপড়ে নেতাজী সুভাষ বসু বলেছিলেন: "এরি মধ্যে লায়েক হয়ে গেছ! হাজতবাস, আর পুলিশের মার, দুটিই হয়ে গেছে। তুমি দেশের কাজে লাগবে"! ইন্টারেস্টিং না? বটেই! আজাদিমুখর সেই বাঙালি

১৯১৫ সালে সিলেটের এক অভিজাত পরিবারে জন্ম নিয়েছেন তিনি; পরিবারের আভিজাত্যের খাতিরেই হয়তো সাহচর্য পেয়েছেন বিনয় বোস, সুভাষচন্দ্র বসু, রায় বাহাদুর সুখময় চৌধুরীর মতো মানুষদের। ভারতবর্ষে ইংরেজদের রিজিক খতম করতে বিপ্লবী নামে তরুণ, যুবকদের সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে আমরা ভাসা-ভাসা জানি; আমীনূর রশীদ সেই বিপ্লবী নামে সন্ত্রাসীদের অন্যতম একজন ছিলেন বলে তৎকালীন সময়ে তাদের কার্যক্রমের ব্যাপারে বিস্তারিত— প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে— জানতে পারা যায়। জেলে ছিলেন মেলা সময়, বিচিত্র অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন মন খুলে। এক জেইলার সাহেবকে দেখে 'ওয়াক থু' বলে দূরে সটকে পড়লেন, কারণ জিজ্ঞাসা করলে তাঁর স্পষ্ট জবাব: "স্যার, ওর মত আড়াইশ' তিনশ' টাকার কর্মচারী

আমাদেরও আছেন কিন্তু কেউই ওর মত থার্ড ক্লাস নহেন।”

অভিজাত পরিবারের সন্তান তো? পড়তে গিয়েছিলেন আলীগড়ে। তখনকার আলীগড়ে ছাত্রদের পোষাক ছিল, চোস্ত পায়জামা, শেরওয়ানী এবং ফেজ টুপি— এ পোষাক না পরে বেরুলে জরিমানা হতো। কিন্তু আমীনূর রশীদ চৌধূরী, আহম্মদ আব্বাস, জহিরবাবার কোরেশী এই তিনজন ছাত্র ফেজ টুপির বদলে গান্ধী টুপি ব্যবহার করলেন! প্রিন্সিপাল ডাকলেন তাদেরকে। তিনি যুক্তির মুখে পড়ে পাঠিয়ে দিলেন তৎকালীন জাঁদরেল ভাইস চ্যান্সেলর স্যার জিয়া উদ্দিনের চেম্বারে— শেষ পর্যন্ত কী হলো? সিদ্ধান্ত হলো, তারা ... টুপি পরবেন।

যারা আত্মজীবনীতে ঐতিহাসিক উপাদান খুঁজে পেতে মরিয়া তাদের জন্য সবচেয়ে আকর্ষণীয় জায়গা হচ্ছে, ভারতভাগের সময় সিলেটের অবস্থান নিয়ে— পাকিস্তান না ভারত কোথায় হবে ঠিকানা! এই নিয়ে নির্বাচনের সিদ্ধান্ত হলো। সেই ঐতিহাসিক নির্বাচনের হালহকিকত পুরোদস্তুর বর্ণনা করেছেন তিনি। এই নির্বাচনেই কংগ্রেসের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হিসেবে কার জন্য যেন তদবির করতে গিয়েছিলেন মাওলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট, তখন তাঁর কর্মকাণ্ড দেখে মাওলানা মন্তব্য করেছিলেন: “জোঁক বহু দেখ চুঁকে মগর আপতো জোঁক সে ভি জেয়াদা খতরনাক হ্যাঁয়” অর্থাৎ জোঁক আমি অনেক দেখেছি কিন্তু আপনি তো জোঁক থেকেও ভয়ংকর ব্যক্তি।

৫ ও ৬ জুলাই সিলেটে গণভোট সম্পন্ন হলো, গণভোটের মাধ্যমে সিলেটের ভাগ্য হেলে পড়লো পাকিস্তানে! আমীনূর রশীদ তো কংগ্রেসের টপ লিডার— তিনি এখন যাবেন কোথায়? সিলেটেই রয়ে গেলেন। কারণ? তাঁর জবানবন্দি: “কলকাতা গিয়ে থাকতে আমার কোন অসুবিধে ছিল না। সেখানে আমার আত্মীয়-স্বজন বন্ধু অনেকে ছিলেন। তবুও কখন সিলেট ছেড়ে চলে যাওয়ার কোন যুক্তিযুক্ত কল্পনা আমার মাথায় আসেনি। এর মুখ্য কারণ কোন কোন দুর্বল মুহূর্তে মনে হয়েছে আমার সহিত হযরত শাহজালালের আত্মিক সম্পর্ক আছে; এ মাটি ছেড়ে অন্য কোথাও যেতে আমার বিবেক সায় দেয়নি।”

আত্মজীবনীমূলক এ কেতাবখানা যে কোনো শ্রেণির পড়ুয়ার জন্য সাজেস্ট করতে দু’বার ভাবা নিষ্প্রয়োজন। কারণ, সাধারণ পাঠক পাবেন সুললিত গদ্যের উম; জীবন-সংগ্রামী পাঠক পাবেন বিপুল চড়াই উৎরাই পেরিয়ে সাফল্যের শীর্ষে আরোহণের চিত্র; ভাবুক, চিন্তক পাঠক পাবেন বেশ কিছু ঐতিহাসিক বিষয়ে নতুন আঙ্গিকে চিন্তার উপাদান।

মহররম সংখ্যা

ডাউনলোড

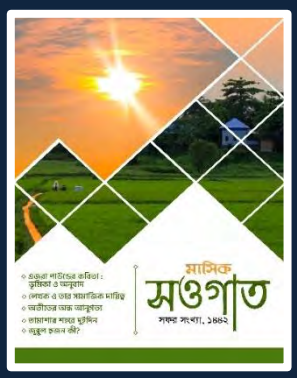

সফর সংখ্যা

ডাউনলোড

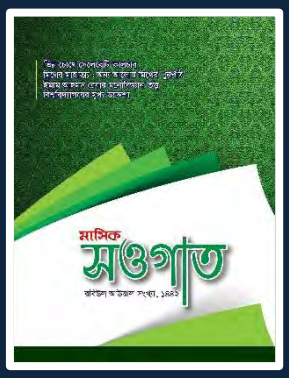

রবিউল আউয়াল সংখ্যা

ডাউনলোড

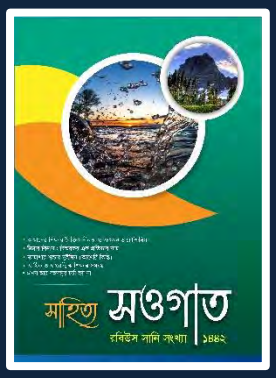

রবিউস সানি সংখ্যা

ডাউনলোড

ফেসবুক গ্রুপ

সওগাতের ফেসবুক গ্রুপে যুক্ত হয়ে আপনিও হয়ে যান সওগাত পরিবারের একজন।

https://www.facebook.com/groups/sowgat

বিজ্ঞপ্তি

সওগাত জমাদিউস সানি সংখ্যায় যারা লিখতে চান তারা গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ বা ভ্রমণ কাহিনী লিখে ১২ জানুয়ারির মধ্যে ই-মেইল করুন নিচের ঠিকানায়:

sowgat.ms@gmail.com

“আমরা তিনটি উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি: প্রথমত, গভীর চিন্তা বা অনুধ্যানের মাধ্যমে যেটা মহত্তম উপায়; দ্বিতীয় যে উপায়ে প্রজ্ঞা লাভ করি সেটা হলো অনুকরণ, যেটা সহজতম; আর তৃতীয় উপায় হচ্ছে অভিজ্ঞতার মাধ্যমে, যেটা সবচেয়ে তেতোময়”

_____কনফুসিয়াস